1

ভূগোলের সংজ্ঞা, বিষয় ও পরিধি
(Definition, Nature Scope of Geography)

সূচনা (Introduction):

মানুষের বাসভূমি রূপে পৃথিবী পর্যবেক্ষণ বিষয়ক ধারণাকে নির্দিষ্ট করার জন্য প্রাচীন যুগে বিখ্যাত ভূগোলবিদ এরাটথেনিস (Eratosthenes) প্রথম জিওগ্রাফি (Geography) শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। দুটি গ্রীক শব্দের মিলনে এই কথাটির উদ্ভব। Geo-পৃথিবী, Graphy-বর্ণনা। সুতরাং, ভূগোল কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল পৃথিবীর বিবরণ। মানুষ তার আবাসভূমিতে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করার প্রথম প্রচেষ্টা হল ভূগোল শাস্ত্রের সূচনা।

এই শাস্ত্রের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে ভূগোলের আলোচনার ক্ষেত্র ছিল পৃথিবীর বর্ণনা। কিন্তু মানুষের জ্ঞান এবং মানব সংস্কৃতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী সম্পর্কে তাদের আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ভূগোলের উপপাদ্য বিষয় প্রসারিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভূগোল শাস্ত্রের সংজ্ঞারও পরিবর্তন হয়। আধুনিক ভূগোলবিদেরা ভূগোলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, ভূগোল হল মানুষ ও তার আবাসভূমির মধ্যে জটিল সম্পর্কের বিশ্লেষণ। পিটার হ্যাগেট (1981)-এর মতে, "The study of the earth surface as a space within which human population lives."

ভূগোলের সংজ্ঞা (Definition of Geography) :

আধুনিক যুগের ভূগোলবিদেরা ভূগোল কথাটির অর্থকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বিখ্যাত মার্কিন ভূগোলবিদ্ **হার্টসন** (Hartshorne) 1939-এর মতে, "ভূগোলের প্রধান উদ্দেশ্য হল ভূ-পৃষ্ঠের বৈচিত্র্যময় চরিত্রের নির্ভুল নিয়ম বিন্যস্ত করা ও যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা ও বর্ণনা দেওয়া।" স্কীফার (schaefer) ভূগোলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন — "ভূগোল এমন এক বিজ্ঞান যা ভূ-পৃষ্ঠের কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের স্থান অনুসারে বন্টনের নির্ধারণকারী নীতিগুলিকে গঠন করে থাকে।"

ভূগোলবিদ **এক্যারম্যানের** (Ackarman) মতে, — "ভূ-পৃষ্ঠের উপরে বিচিত্র উপাদানগুলি স্থান অনুসারে বন্টন ও বিভিন্ন স্থানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সমূহের পর্যবেক্ষণ।" অন্য এক ভূগোলবিদ্ **স্কীফারের (Schaefer 1950)** মতে "ভূ-পৃষ্ঠের বিশেষ বিশেষ বিষয়ের দেশগত বন্টন সম্পর্কে সূত্র গড়ে তোলে এমন এক বিজ্ঞান হিসাবে ভূগোলকে দেখতে হবে। অর্থাৎ তিনি মনে করেন ভূগোল একটি দৈশিক বিজ্ঞান। যার মূল বিষয়বস্তু হল দেশ এবং যা কতগুলি প্রাথমিক অনুমানকে ভিত্তি করে করা হয়। পরবর্তী সময়ে ভূগোলবিদ্ **টাথে (Taathe 1970)** মনে করেন যে, "ভূগোল হল বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত স্থানভিত্তিক পর্যায়সমূহের পর্যবেক্ষণ।" মার্কসের দৃষ্টিকোণ থেকে ভূগোলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে **পিট (Peet-1977)** বলেন যে, "ভূগোল হল একটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের সেই বিশেষ অংশ যাকে একদিকে বিভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক সম্পর্কে এবং অন্যদিকে স্থানভিত্তিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।" ফরাসী দেশের ভৌগোলিক **ভিদাল-ডি-লা-ব্লাচে (Vidal-de-la-Blache)** বলেন যে "ভূগোল মানুষের বিজ্ঞান নয়, স্থানের বিজ্ঞান।" ভূগোলবিদ **জোন্স (Jhons)** বলেন যে "ভূগোলের মূল উদ্দেশ্য

Scanned with CamScanner

হল ভূ-পৃষ্ঠের উপরে বিভিন্ন অবস্থানের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট অবস্থানের সঙ্গে অন্যান্য অবস্থানের সম্পর্ক এবং এরূপ সম্পর্ককে পরিবর্তনকারী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা।"

পরিশেষে সাধারণ সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা যায় — "ভূগোল হল এমন এক বিজ্ঞান যেখানে জলবায়ু, মৃত্তিকা, উচ্চতা, উদ্ভিদ, জনসংখ্যা, শিল্প, জমির ব্যবহার প্রভৃতি উপাদানের বিশ্বব্যাপী পরিধি বিন্যাস ও পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ভূ-পৃষ্ঠের স্থানগত বৈষম্য ও ঐ সকল একক উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্ট অঞ্চল সমূহের আলোচনা করা হয়।"

ভূগোলের উদ্দেশ্য (Scope and content of Geography) :-

ভূগোল হল এমন এক বিজ্ঞান যেখানে মানুষ ও তার পরিবেশের মধ্যে জটিল পারস্পরিক সম্পর্কসমূহের আলোচনা করা হয় এবং ভূগোল শাস্ত্রের মানুষ ও পরিবেশ সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। ভূগোলবিদদের প্রধান কাজ হল ভূ-পৃষ্ঠের ওপর বিভিন্ন অবস্থানের মানুষ ও তার পারস্পরিক সম্পর্কসমূহের পর্যবেক্ষণ করা। এই সম্পর্কগুলিতে তিনটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় সেগুলি যথাক্রমে — (1) মানুষ-প্রকৃতি বা পরিবেশ সম্পর্ক, (2) আঞ্চলিক পৃথকীকরণ এবং (3) অবস্থান।

(1) মানুষ-পরিবেশ সম্পর্ক (Man-Environment Relation) : মানুষ এবং পরিবেশের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান। এই সম্পর্কটা এতটাই জটিল যে অধিকাংশ ভূগোলবিদগণের মধ্যে একটা মতভেদের সৃষ্টি ঘটেছে। আধুনিক ভূগোলবিদেরা সম্ভাবনাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সমর্থন করলেও এরূপ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশকে মানবীয় কার্যাবলীর এক প্রধান নিয়ন্ত্রক রূপে গণ্য করেন। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ হতে দেখা যায় যে মানুষ কেবলমাত্র তার পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। অনেক সময়ই মানুষের কার্যাবলী পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং প্রয়োজনে পরিবেশকে পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশের সকল প্রকার উপাদানের মধ্যে সম্ভবত জলবায়ুগত অবস্থাই মানুষের উপর সর্বাধিক এবং প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অতি প্রাচীনকাল হতেই ভূগোলবিদেরা মানুষের কার্য্যাবলী ও আচরণের উপর জলবায়ুর প্রভাব বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুসারে বলা যায় যে মূলতঃ জলবায়ুগত অবস্থার পার্থক্যের কারণেই সমাজ ব্যবস্থার আঞ্চলিক তারতম্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে ভূমিরূপ, জলনির্গম প্রণালী, উদ্ভিদ, প্রাণী, মৃত্তিকা, খনিজ ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলিও মানুষকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ তার প্রায় সকল প্রকার বা সব চাহিদা পূরণের জন্য কেবলমাত্র প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল থাকে না। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে এই নির্ভরশীলতার মাত্রা ও প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায় যে কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির উপর নির্ভরতার মাত্রা হ্রাস পেয়ে থাকে।

সভ্যতার আদিমযুগ হতে মানুষ তার প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিবর্তিত করার চেষ্টা করেছিল এবং প্রথম আগুনকে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিবর্তনের প্রচেষ্টার সূচনা হয়েছিল। এরপর ধীরে ধীরে পশুপালন, কৃষিকার্যের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বন্য পরিবেশকে চারণভূমি এবং কৃষি উপযোগী জমিতে রূপান্তরের মাধ্যমে প্রকৃতিকেও পরিবর্তনের চেষ্টা করে মানুষ ধীরে ধীরে বনজ সম্পদ সংগ্রহ, মৎস্য শিকার, খনিজ উত্তোলন ইত্যাদি নানা ধরণের কাজকে উপজীবিকা রূপে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটতে থাকে, বর্তমানে উন্নত বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার সাহায্যে মানুষ তার প্রাকৃতিক পরিবেশকে অধিকমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে,

ভূ-পৃষ্ঠের উপরে প্রত্যেক নির্দিষ্ট অবস্থানের প্রাকৃতিক এবং মানবিক ও অপ্রাকৃতিক উপাদানের এক সুনির্দিষ্ট সমাহার দেখতে পাওয়া যায়। ভূগোলবিদরা এই সমস্ত উপাদানকে শুধুমাত্র পর্যালোচনাই করেন না ঐ উপাদানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ও সামগ্রিক সম্পর্কগুলোকেও অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। ভূগোলবিদরা মানুষ ও তার পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে ৩টি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন।

(a) জিওক্রেটিক (Geocratic) উপাদান সম্পর্ক :- গ্রিফিথ টেলর (Griffithtailor) মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্ককে জিওক্রেটিক (Geocratic-1967) বলে আখ্যা দেন। এখানে ভৌগোলিকরা পরিবেশ ও পরিবেশের পরিবর্তনের উপর অধিক পরিমাণে জোর দেন এবং এখানে বলা হয় যে মানুষের সমাজ ও জীবন ধারার সমস্তই নিয়ন্ত্রিত করে পরিবেশ।

(b) থিয়োক্রেটিক (Theocratic) দৃষ্টিকোণ :- এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভূ-পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্যগুলোকে তাদের সৃষ্টির অন্তর্নিহিত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবণ করার চেষ্টা করা হয়। জার্মান দার্শনিক হেগেল-এর মতে সমস্ত প্রাকৃতিক বিষয়েই কোন না কোন দিক রয়েছে। সেই কারণগুলি ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানে সহজ নিয়ন্ত্রণবাদী মডেলের সংমিশ্রণে সৃষ্টি ঘটেছে থিয়োক্রেটিক মতবাদ।

(c) উইওক্রেটিক (Weocratic) দৃষ্টিকোণ :- এই দৃষ্টিকোণ থেকে টেলর মানুষ প্রকৃতির সম্পর্ককে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। এই মতে মনে করা হয় প্রকৃতি কেবলমাত্র কয়েকটি সম্ভাবনা মানুষের সামনে তুলে ধরে ঐ সম্ভাবনাগুলিকে ব্যবহার করা বা না করা তা নির্ভর করে মানুষের প্রয়োজনের উপর। অর্থাৎ মানুষের ভূমিকাই সক্রিয় ও মুখ্য। মানুষ তার বুদ্ধিশক্তি ও সংস্কৃতির সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্ভাবনাগুলো থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়টি বেছে নেয়। তাই এই দৃষ্টিকোনকে সম্ভাবনাবাদ বলা হয়।

(2) আঞ্চলিক পৃথকীকরণ (Regional Differentiation) : আঞ্চলিক ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পৃথিবীর কোন একটি এলাকা বা অঞ্চল অন্য অঞ্চল হতে বিভিন্ন দিক হতে স্বতন্ত্র হতে পারে।

ভূগোলে এই আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল উদ্দেশ্য হল অঞ্চলের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ এবং স্থানানুসারে এদের পার্থক্য বিশ্লেষণ। প্রাথমিক ক্ষেত্রে ভূগোলের অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থকগণ প্রধানত ভূ-পৃষ্ঠের উপর অবস্থিত বিভিন্ন স্থানের বিবরণের মাধ্যমে তার অবস্থান নির্ণয়ে আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন যে প্রতিটি পৃথক পৃথক স্থানই হল এক একটি একক বস্তু এবং এদের মধ্যে বিভিন্ন উপাদানগত যে পার্থক্য বর্তমান তা তাদের একটিকে অন্যটি হতে পৃথক হতে সাহায্য করে। তবে একথাও ঠিক যে এই সকল স্থানিক উপাদানগুলি পরস্পরের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলে একটি অঞ্চলের সীমার মধ্যে একটা সাধারণ সমসত্ত্ব অঞ্চলের সৃষ্টি ঘটে। ভৌগোলিকগণ এরূপ একক পৃথক সমাবেশগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের ব্যাখ্যা করেন এবং এই সকল ধারণার ভিত্তিতে ভূগোলে আঞ্চলিক বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই ভূগোল শাস্ত্রে আঞ্চলিক পৃথকীকরণ নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

আঞ্চলিক পৃথকীকরণের ধারণাটি মূলত তিনটি অনুমানের ভিত্তিতে সংগঠিত করা হয়েছে — (i) স্থানভিত্তিক উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, (ii) এই সকল উপাদানগুলির বিচিত্র সমাহার এবং বিচিত্র জটিল পারস্পরিক সম্পর্ক, (iii) আবার এই জটিল সম্পর্কগুলি স্থান অনুসারে আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রকাশ করা। অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ব্রিটেনের ভূগোলবিদগণ অঞ্চলকরণের বিষয়ে বিশেষ গবেষণার দিকে গুরুত্ব দেন এবং যে সকল বিষয়ে নজর দেন সেগুলির মধ্যে প্রধান গুলি হল — (i) আঞ্চলিক বর্ণনা, (ii) অঞ্চলকে কার্যাবলী ভিত্তিক বিভক্তকরণ, এবং (iii) আঞ্চলিক বিশ্লেষায়ণ। তাই সর্বশেষ একথা ঠিক যে ভূগোলশাস্ত্রে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে নানাবিদ্

Scanned with CamScanner

ভৌগোলিক উপাদানের তারতম্যকে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত বিভিন্ন স্থানে জৈব ও অজৈব বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এই তারতম্য একদিকে যেমন বিশ্বব্যাপী হতে পারে, আবার তা সীমিত বা সুনির্দিষ্ট স্থানেও দেখা যেতে পারে। ভূগোল শাস্ত্রে মূলত এই তারতম্যকে যথাযথ বিশ্লেষণ করা সম্ভব। তাই বলা যায় যে, ভূগোল শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হল অবস্থাগুলির প্রাকৃতিক ও মানবীয় স্থান অনুসারে বন্টনের ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়।

(3) অবস্থান (Location) : ভূগোলে অবস্থান বলতে কোন অঞ্চল এলাকা বা কোন স্থানের পারিসরিক অবস্থান বলে বর্ণনা করা হয়। ভূগোলে অবস্থানের ধারণা একটি অন্যতম পুরাতন ধারণা। পৃথিবীর কোন স্থান বা অঞ্চল সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমেই মনে আসে ভূ-পৃষ্ঠে তার সঠিক জায়গা সম্পর্কে। কারণ প্রতিটি স্থানের প্রাকৃতিক ও মানবীয় বৈশিষ্ট্যগুলি স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব তাই একে ভূগোলে পারিসরিক অবস্থান বলে বিবেচনা করা হয়। কারণ এখানে প্রাথমিক ভাবে (a) স্থানটির অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ অনুসারে বিশেষ অবস্থান, (b) এর পরবর্তী সময়ে আপেক্ষিক অবস্থান এবং সর্বোপরি, (c) বিভিন্ন অবস্থানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজে বার করার চেষ্টা করা হয়।

ভূগোলে স্থান বিষয়ক ধারণার মূল ভিত্তি হল প্রত্যক্ষবাদী দর্শন। কারণ প্রত্যেক ভৌগোলিক অবস্থান হল একটা পর্যবেক্ষণের উপযোগী বাস্তব বিষয়। তাই প্রত্যক্ষবাদীরা মনে করেন যে প্রত্যেক অবস্থানকেই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করা সম্ভব। পূর্বে ভূগোলবিদগণ ভূ-পৃষ্ঠের উপরে বিভিন্ন অবস্থানকে তাঁদের ব্যক্তিগত নাম অনুসারে চিহ্নিত করতেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরা ব্যক্তিগত নামের পরিবর্তে কিছু স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার সাহায্যে (Co-ordinate System) ভূ-পৃষ্ঠের কোন স্থানের অবস্থানকে নির্দ্ধারণের চেষ্টা করেন। অবস্থান নির্দ্ধারণের জন্য ব্যবহৃত এরূপ একটি বিশেষ স্থানাঙ্ক হল অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ। যাকে স্থানিক বা স্থানের ভাষা (Spatial Language) বলে অভিহিত করা হয়। এই স্থানিক অবস্থা ব্যাতিত অবস্থান বিষয়ক চিরাচরিত ধারণাগুলিকে মূলত রীতিসিদ্ধ অবস্থান (Formal site) বা ভূ-পৃষ্ঠের একটি নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ উপযোগী বাস্তব স্থানকে ভিত্তি করে করা হয়। আধুনিক ভূগোলে আবার ঐ রীতিসিদ্ধ অঞ্চলের পরিবর্তে কার্যাবলী ভিত্তিক (Functional Location) এর কথা বলা হয়। এখানে মনে করা হয় যে কেবলমাত্র একই স্থানে সমবেত হবার কারণেই কোন নির্দিষ্ট অবস্থানের সকল উপাদান পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে না। একটা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেও এই সমস্ত উপাদান সামগ্রীকভাবে কার্যকর হবার ফলে এরা একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

ভূগোলশাস্ত্রে অবস্থানের গুরুত্ব বিচার করার ক্ষেত্রে বিখ্যাত ভূগোলবিদ ডেভিড হার্ভে (David Harvey) মনে করেন স্থান-ভিত্তিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অবস্থানকে সামগ্রীকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। অন্য এক ভূগোলবিদ জোন্স (Jones) বলেন যে সমস্ত ভৌগোলিক অনুসন্ধানের কেন্দ্রবিন্দু হল অবস্থান। কারণ এরূপ অনুসন্ধানের প্রধান বিষয়গুলি হল ভূ-পৃষ্ঠে কোন স্থানের অবস্থান নির্ণয় করা। এবং ঐ স্থানের সঙ্গে অন্যান্য স্থানের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা।

ভূগোল শাস্ত্রের অন্য আরেকটি প্রধান উদ্দেশ্য হল জৈব ও অজৈব উপাদান সমূহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় কার্যাবলীর পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করা ও সেই পর্যবেক্ষণের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা। এই পরিবর্তন সমূহ এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে পৃথিবীর জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না।

Scanned with CamScanner

২. ভূগোলের পরিধি (The scope of Geography) বর্ণনা কর।

উত্তর প্রাচীন কালে ভূগোল বিষয় ছিল ক্ষেত্রসমীক্ষাবিদ্যা বা Chorology-র সমর্থক। হিপোক্রেটাস-এর যুগ থেকেই অধিকাংশ পণ্ডিতগণই ভূগোল বিষয়ে বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছিলেন, তবে তাঁরা প্রায় সকলেই ভূগোলের মূল বিষয়বস্তু হিসাবে 'প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্ক'-কেই চিহ্নিত করেছেন। ভূগোলের পরিধি নিয়ে ভৌগোলিকদের মধ্যে মতবিরোধও যথেষ্ঠ থাকলেও ভূগোলের বিষয়বস্তুর যে প্রধান দু'টি অংশ রয়েছে তা তাঁদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়। আর সেই দু'টি অংশ হ'ল মানবগোষ্ঠী এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশে উপাদানগুলির বৈশিষ্ট্য, পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা, পরিবর্তনশীলতা প্রভৃতি ভৌগোলিকদের আলোচনা তথা বর্ণনা সেই সঙ্গে প্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে মানুষের ভূমিকা তথা পরিবেশ ও মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং জটিল সম্পর্ক বিশ্লেষণই প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

রজার মিনশূলের মতে (১৯৭০) "ভূগোল সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই হ'ল প্রাকৃতিক ও মানবীয় উপাদানসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যোগফল হিসাবে গড়ে ওঠা ভূ-চিত্রকে অনুসন্ধান করা।" সুতরাং ভৌগোলিকদের উদ্দেশ্যই হ'ল ভূ-পৃষ্ঠে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সব কিছুই সমীক্ষা করা। এই সমীক্ষা করতে গিয়ে ভৌগোলিকদের ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিটি অংশকে প্রতিটি বিষয়ে পার্থক্য, বৈচিত্র্যকে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে হয়। কোন ভৌগোলিক এককভাবে পৃথিবীর প্রতিটি স্থানকে পৃথকভাবে গবেষণা বা বর্ণনা করতে পারেন না বা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সেক্ষেত্রে ভৌগোলিকগণ নিজেদের পছন্দ ও দক্ষতা অনুসারে ভূ-পৃষ্ঠের এক একটি অংশ বেছে নিয়ে একটি পৃথক লক্ষ্য নিয়ে গবেষণা করে থাকেন। ভৌগোলিকদের ভূ-পৃষ্ঠের বিষয়গুলি গবেষণার সময় একাধিক বিষয় খুব স্বাভাবিকভাবে

Scanned with CamScanner

এসে পড়ে। যেমন-জলবায়ুবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ভূ-তত্ত্ব, মৃত্তিকাবিদ্যা প্রভৃতি। ফলে ভৌগোলিকদের শুধুমাত্র ভৌগোলিক জ্ঞানই নয়, সেইসঙ্গে অন্যান্য বিষয়গুলি উচ্চস্তরের জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। তাই লুক্যারম্যান যথার্থই বলেছেন-"The geographer's purpose is to understand man's experience in space."

ভূগোলের পরিধি তাই সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তবে ভূগোলের মূল বিষয়বস্তু রূপে 'দেশ'-ই প্রাধান্য পেয়েছে। সুতরাং পরিশেষে ভূগোলের বিষয়বস্তুগত পরিধিকে বিভিন্ন ভৌগোলিকদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়—

(ক) ভূগোলের প্রধান বিষয় প্রকৃতি ও মানুষকে পৃথকভাবে এবং প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ক অনুধাবন করা, সেই সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের বৈচিত্র্যতা পর্যবেক্ষণ করা বা মানুষের ওপর প্রকৃতির প্রভাব পর্যালোচনা করা।

(খ) গবেষণাক্ষেত্র হিসাবে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন বৈচিত্র্যতাসম্বনিত অঞ্চলের চরিত্র অনুধাবন করা তথা বর্ণনা করা।

(গ) অঞ্চলভেদে প্রয়োজনানুযায়ী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা।

(ঘ) পৃথিবীর দৈশিক বন্টন অনুধাবন করা।

(ঙ) ঘটমান বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে সমন্বয়সাধনের প্রচেষ্টা এবং সমন্বয়সাধনের প্রভাবগুলি পর্যালোচনা করা।

(চ) দৈশিক আচরণ সংক্রান্ত সূত্র গঠন করা।

(ছ) দৈশিক গঠন এবং সংগঠন ব্যাখ্যাকারী মডেল নির্মাণ এবং সেইসকল মডেলগুলিকে বাস্তবায়িত করা।

(জ) বিভিন্ন বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দিয়ে ভূগোলের কেন্দ্রিয় ভাবনা বা গবেষণাকে সঠিক পথে চালিত করার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও সামাজিক ভূগোলের বিষয়বস্তু আরোও বিস্তার, বৃদ্ধি করা।

তবে বর্তমানে ভূগোল একটি সংশ্লেষী বিষয় হিসাবে পরিচিত হওয়ায়, এর বিষয়বস্তুর পরিধি ক্রমেই বেড়ে চলেছে ; একদিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অপরদিকে সমাজবিজ্ঞান বা মনুষ্যবিজ্ঞান-এর সমন্বয়ে ভূগোলকে বুঝতে হবে।

Scanned with CamScanner